রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সফলতার সদুপায়

প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল তখন এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সম্প্রতি সে সংকল্প বন্ধ হওয়াতে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাদ দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাট-বাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনোই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম নষ্ট হয়, এবং

ধর্মএব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই এক পক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্যয় আপনি ঘটাইবে ; নিরস্ত্র নিঃসত্ত্ব নিরন্ন ভারতের দুর্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু, রাষ্ট্রনীতিকে বড়ো করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। বিশেষত, লোভ যখন বেশি হয় তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ-- ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়-- চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা-- এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি ? যে সময়ে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি ; যে সময়ে কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথু-আর্নল্ড্ আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন ; যে সময়ে গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত ; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না, একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে ; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে ; যে সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা-- ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না বলিব তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভালো করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয় তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না, যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই। এই-সব কথা ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান

হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে-- কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি। সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব যাহার দ্বারা তাঁহারা এক মুহূর্তে আশ্বস্ত হইবেন ? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয় ? যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্বাচীন যে এমন কথায় মুহূর্তকালের জন্য শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে ? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে-পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়ীভাবে উদ্ভূত হয়, সে-পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে ডাকাইয়া-- সেই স্বার্থকে যত বড়ো নামই দাও-না কেন, নাহয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ই বলো-- যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারত-রাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চ-অঙ্গের ধর্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কী জবাব আছে। এ কথাটা সত্য যে, আমাদের দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান বলবান হইয়া উঠিতেছে ; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে ; যে-সকল জ্ঞান, যে-সকল ভাব কেবল ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে ; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে ; এক সময়ে যে-সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালার মুখস্থ কথা মাত্র ছিল এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায় স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কি বলিতে পারি, 'না, তাহা হইতেছে না' এবং বলিলেই কি কাহারো চোখে ধুলা দেওয়া হইবে ? জ্বলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে-- না, তাহার আলো নাই ?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে অন্তত চারটে বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কী বলিতে পারি ? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়িবে। যখন বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে, তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা কী করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে-- তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু ! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে ? আমরা জানি পার্লামেন্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষের জবাব দেয় ; সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুশি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না-- এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই !

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বাম-হাত ডান-হাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই।

আমরাও কি তেমনি একই ? গবর্মেন্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে ? তাঁহারা যে-ডাল নাড়া দিলে যে-ফল পড়ে আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব ? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না ; এ সম্বন্ধে মিল কী বলিয়াছেন, স্পেন্‌সর কী বলিয়াছেন, সীলি কী বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার সিকি-পয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই ; নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত করো না। যখন য়ুনিভার্সিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা

কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম ? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেন্ট আমাদের বিদ্যার উন্নতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন ? কারণ, লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসন সম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই করো, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেন্ট আছে, সে দেশেও এডুকেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল-- কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য ফল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এতবড়ো বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। কখনোই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রমসংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতে হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য করা একই।

আমাদের দেশে সে কথা খাটে না। কারণ, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এবং আমরা কর্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন, ‘সে কী কথা। আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর -- আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না কেন। আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব’। গোরু যে নন্দনন্দনকে দুই বেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে দুধের হিসাব তলব না করে ! কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

সাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে করো-না কেন, ফরাসি রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মতলব করে, তবে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন-কি, তাহাকে ধর্মোপদেশও শোনায় না-- তখন ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়-- এইজন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জার্মানি যখন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজ রাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জার্মানরাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল যেদিন মোগল-সভায়, নবাবের দরবারে, ইংরেজের বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য প্রসন্নতার সহিত গায়ে মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। আর, আমাদের দেশে আমাদের মতো নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা করিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে ? যে দুধের মধ্যে মাখন আছে, সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে ; কিন্তু মাখনের দুধ রহিল গোয়ালবাড়িতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতে কি মাখন জুটিবে ? যাঁহারা পুঁথিপন্থী তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন-- আমরা তো কোনোরূপ সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভালো। মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ন্যায্য স্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেন্ট বলিতে তো একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছেন-- তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়্‌রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এ দেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়সংশোধনের সুন্দর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবে না। এমন-কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করেন না ; জজের মন বুঝিয়া অনেক সময় ভালো তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় বিচারকের কাছে মৌখিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়-- তাহার কারণ, জজ তো আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মনুষ্য।

যিনি আইন সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্‌পাত করাও প্রয়োজন হইবে না ?

কিন্তু আমাদের যে কী ব্যবস্থা, কী উদ্দেশ্য এবং কী উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিকাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব-- গবর্মেন্ট যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি। কিন্তু আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি-- আমার যা-কিছু বক্তব্য সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে এই-সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনা, এই-সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার একদিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে ? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন-- ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোটো ছোটো আঘাত নানা দিক হইতে আসিয়া পড়ে-- হাতে হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিতপ্রতিকারের জন্য দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দিকে ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ এখানে বেদনা ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনিতখনি সেটা নিবারণের জন্য রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই-সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জ্বালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেমনি প্রত্যেক তাড়নার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই-- কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথা তৃপ্তি, তাহাই ভোগ করিবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হই নাই ; আমি দুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশী লোকের কাছে উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বারংবার ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য উপলক্ষস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধারক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেক বার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত, বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেখানে বজ্র পড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গভ্রতবিধি নাই ; আমার পরামর্শ প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না। তৃতীয়ত, বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য। যেখান হইতে বজ্র পড়ে সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্রদণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে বিচারপূর্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তুত, আজ যে পোলিটিকাল প্রসঙ্গ লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছি সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা

আওয়াজ, কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশ্চর্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে ? আজ যাঁহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম তিনি সাড়া দিলেন না-- অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইঁহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি বা দয়া করেন তবু আশ্বস্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাল-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড়ো অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায় ?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। 'সনাতন ধর্মশাস্ত্রমতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়' বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে স্থলে ধর্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক দুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক-- পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে-- আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁত ইংরেজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক, রাগারাগি করা চলে না।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যবসা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র খ্রীস্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন-- আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দুভ্রাতা আইনের বিরূপতাসত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া এই লাখ টাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খ্রীস্টানধর্মের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন-- আইনমতে যাহা আমার তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জো থাকিত না। কারণ, সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও ধর্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবি খাটে না। সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্ত্বের জোরে যান, মহতের গৌরবই তাই ; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভালো বাগ্মী-- যদি বলিত, বিজিত পরদেশী সম্বন্ধে অল্পসংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক আশঙ্কাবশত যে-সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে তাহা আমরা করিব না-- যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্মেন্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব, সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয় এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে, এ দেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণই এদেশবাসীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবরদারি করিতে আসিয়াছি এমনিতরো নিরাসক্তভাবে কাজ করিয়া যাইব-- তবে আমাদের মতো লোককে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে ততকাল আমরা ধন্য হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই ; তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক্ ; আমরা মুড়ি খাই তোমরা চাহিয়া দেখো, অথবা তোমরা চাহিয়া দেখো আমরা মুড়ি খাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে-- সেই হিসাবে যা পাই তাই ভালো, তাহার উপরে যাহা জোটে সেটা নিতান্তই উপরি-পাওনা, তাহার জন্য আদালতে দাবি চলে না,

এবং কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া সেরূপ উপরি-পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে দুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোটে। সুদূর য়ুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে-- ফরাসি, জার্মান, রুশ, ইটালিয়ান, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল, তাহাদের সম্বন্ধে সর্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয় ; আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছ-অনিচ্ছা রাগদ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেন্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক ; ইংরেজ স্রোতের জলের মতো নিয়তই এ দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে সেও স্বজাতির সঙ্গে-- এখানকার ইতিবৃত্তচর্চার ভার জার্মানদের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দীসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেন্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে-- এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোটো, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, ব্যাপারখানা এই এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র তাহার মর্মান্তিক বেদনাকেও, তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার একটুখানি মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া, আমরা ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য হইতেছি-- এত কলরবেও মনের মতো ফল পাইতেছি না কেন ? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে সেখানে যদি যাইতে পারিতাম তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোটো দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জন সাহেব অমন অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়ালতন্ত্রের মধ্যে বিসর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন ? সর্বনাশ ! আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার ! এ যে একেবারে প্রণয়সম্ভাষণের মতো শুনাইতেছে ! এই, অস্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল-আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্যাপ্ত প্রেমের সংগীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্যন্ত দুর্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে-- তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা ! এতবড়ো অত্যুক্তিতে যদি কর্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি। আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে ! কর্জন সাহেব আমাদের সুখদুঃখের সীমানা হইতে বহু ঊর্ধ্বে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না ! নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছটফট করে কেন ! এ কেমনতরো-- যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্যসিন্দুর-হস্তে লোক আসে, এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়-- এ কী আশ্চর্য, এতবড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি ! হায়, অন্যেরর

যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে এত প্রভেদ তাহা যে সে এক মুহূর্তেও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর। ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো ; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা ; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয় তখন জমার অঙ্কের এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এমনিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক এবং যাহা স্বাভাবিক তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখো, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি 'তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো-- তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব করো' তখন ইংরেজ জবাব দেয়, 'আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের যে নিম্নতম কোঠায় আমি আছি সেই কোঠায় তুমিও এসো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই-- স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো-- স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার অন্তত আরাম বলো অর্থ বলো কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!' এ কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি-- আলস্যপূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি, ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই, ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও 'হান্টার' বৈ গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে-- যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই-- এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনোই যথার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে টাকা অনেক আছে, অন্য পক্ষে শুদ্ধমাত্র চেকবইখানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না-- ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক-একবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল-- কিন্তু সে অপমান সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হউক আর নিঃশব্দেই হউক গলাধঃকরণপূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড়ো কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়। পুরাতন কথা বলিতেছি এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব। আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জিত এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন যে 'এ আবার তুমি কী নূতন কথা তুলিয়া বসিলে' তবেই আমার পক্ষে মুশকিল-- কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। এমন-কি, শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে

অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে সেই জানে যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে-- যেমনই আলো হয় অমনি মুহূর্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকার রাত্রি-- এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণিক কথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন তবে তাহাও সকরুণচিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা তাহা নহে। আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারো কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থারিত তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত-- আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য ; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য ; আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য-- কোনো বিশেষ আইন রদ করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ তাহা সমস্ত উদ্‌বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে ; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য, যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুই চারি জন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহলমীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই-যে থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে-- আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সম্বন্ধে গাম্ভীর্য রক্ষা করা আর তো সম্ভব হয় না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল-- সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরো উলটা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ

অমূলক। এক পক্ষে কেবলই চাওয়া, আর পক্ষে কেবলই দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়। ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নিবানো যায় না, সে তো শাস্ত্রেই বলে-- এরূপ দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায় বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল দাতার পক্ষেও তেমনি অসুবিধা।

কিন্তু, যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল-- সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেও এক স্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেন্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু, তাই বলিয়া সকল কর্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বড়ো শক্ত। এই মনে করো-- স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্ এই কান্না! যাহা একজন দিতে পারে তাহা আর-একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে!

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে-- কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি-- যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই। এজন্য গবর্মেন্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক স্বায়ত্তশাসন। তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের কেহ নাই।

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে 'গবর্মেন্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব'-- তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, 'দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।' তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ-- যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্ত চিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি-- রিপনের জয় হউক এবং কর্জনও বাঁচিয়া থাকুন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে ? কর্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জীব দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম দিবে সেই আমাদের প্রতি

কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না-- যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনোই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে-- সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্ত-কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সমুদ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের ব্যাবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো-কারো কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্‌স্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড়ো কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায় তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি-- তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হালকা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারি করিয়া তোলা কর্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু, আমাদের নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উলটা দিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলায় ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয় তখন নিজের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলই উষ্ণবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে দিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড়ো হইয়া উঠে। যথার্থভাবে গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্ত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়-- ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলি-- প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসংগত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্য দ্বারা দুর্বলতার বৃদ্ধিই হয়-- ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই-সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে-- স্বভাবের দুর্বলতার উপরে নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের উপরেও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়া মাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্বলতা তাহাকে বড়ো নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি তাহা নহে-- গর্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখো, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্যভার যদি

অন্যে গ্রহণ করে তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে ; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনামতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা যে আমাদের দেশে সুলভ নহে, এ কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই তাহা আছে ভান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কী আছে। এ সম্বন্ধে উত্তর এ যে, দেশহিতৈষিতা আমাদের যথেষ্ট দুর্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না-- কারণ, সেরূপ অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের এই দুর্বল দেশহিতৈষিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার উপলক্ষ আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না-- যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে এক স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি তাহা যে একদিনেই হইবে, কথাটা পাড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারি দিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে খর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ-- কাজ করিতে করিতে এই-সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উলটা হয়-- এই-সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতে দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমনসকল খাঁটি লোক শক্ত লোক যাঁহারা আছেন যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা, কেবল কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন-কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না ; আমি যাহা ব্যবহার না করিব অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে ; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে ; আমি যদি শক্তি অর্জন না করি অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে ; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে-- ইহা বিশেষ অনিবার্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু, যদি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার ‘নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব’, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা-- এই মহৎ

সৃষ্টিকার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে, এড়ন্য আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করো নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা চার খানা করিবার সংকল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃখের বিষয়-- কিন্তু শুধু কি নিরাশ্বাস দুঃখভোগেই এই দুঃখের পর্যবসান ? ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই ? শুধুই অরণ্যে রোদন ? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুই টুকরা করিতে গবর্মেন্ট পারেন ? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না ? বাংলাভাষাকে গবর্মেন্ট নিজের ইচ্ছামত চার খানা করিয়া তুলিতে পারেন ? আর আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না ? এই-যে আশঙ্কা ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে ? যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয় তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না ? সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমুদয় উদ্‌যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের কয়েকজনের চেষ্টাতেই সেই বৃহৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা দুরূহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এ পর্যন্ত আমরা ফুটা কলসে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেইজন্যই বার বার আক্ষেপ করিয়াছি-- এ দেশে কাজ করিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজি ভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছি, দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরূপ উদাসীন কেন। ইংরেজি ভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন পাস করিয়াছি, অথচ দুঃখ করিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন। পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি, এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন। একবার যথার্থ কর্মের সহিত যথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক, তাহার পরেও, যদি সফলতা লাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব--

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

সংকটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে দুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি --- রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু, খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে-- যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক্ হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিম্নতম গুহার গভীরতম ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে ?

একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্তিত অনুবাদ দ্বারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি--

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি পরে জানি
কমলা সদয় !
পরে করিবেক দান, এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে !
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

চৈত্র ১৩১১